কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ তৃতীয় অধ্যায়: রিসালাতের ঈমান

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৩. ২. ১২. ৫. তাঁর দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিষয়ক বিতর্ক

উপরে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহ নবী-রাসূলগণকে সাধারণভাবে এবং মহানবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বিশেষভাবে অনেক মর্যাদা, অলৌকিক বৈশিষ্ট্য ও মুজিযা দান করেছেন। পরবর্তী বিভিন্ন পরিচ্ছেদে এবং বিশেষত শিরক-কুফর বিষয়ক অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, নবী-রাসূলগণের অলৌকিক বৈশিষ্ট্য ও মুজিযাকে ‘ক্ষমতা’ ও অধিকার ধারণা করে পূর্ববর্তী উম্মাতের মানুষেরা শিরকে নিপতিত হয়। এ জন্য কুরআন কারীমে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে মুজিযা, শাফা‘আত বা অন্য কোনো কিছুই নবী-রাসূলগণের ইচ্ছাধীন বা ক্ষমতাধীন নয়, বরং আল্লাহর ইচ্ছাধীন ও ক্ষমতাধীন। বিশ্ব পরিচালনা বা কারো মঙ্গল অমঙ্গলের ক্ষমতা বা দায়িত্ব মহান আল্লাহ নবী-রাসূলগণকে দেন নি। এ বিষয়ে অনেক আয়াত আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ

“বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরেও আমার কোনো অধিকার নেই।”[1]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعًا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ

“বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করে তা ব্যতীত আমার নিজের ভালমন্দের উপর আমার কোনো অধিকার নেই।”[2]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلا بَلاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالاتِهِ

“বল, আমি তোমাদের ইষ্ট-অনিষ্টের ক্ষমতা বা মালিকানা আমার নেই। বল: আল্লাহ থেকে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পরবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত আমি কোনো আশ্রয়ও পাব না, কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে পৌঁছানো এবং তাঁর বাণী প্রচার (আমাকে রক্ষা করবে)।”[3]

কুরআন ও হাদীসে বারংবার দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহই মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। তিনি ছাড়া আর কেউই কোনো মানুষকে বিপদ-কষ্ট থেকে উদ্ধার করতে পারে না। এর বিপরীতে কখনোই কোনোভাবে কুরআন ও হাদীসে একটি স্থানেও বলা হয় নি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা অন্য কোনো নবী বা ওলী কোনোভাবে কাউকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা রাখেন বা আল্লাহ কাউকে এরূপ কোনো ক্ষমতা প্রদান করেছেন। এ অর্থের আয়াত ও হাদীস অনেক। একস্থানে আল্লাহ বলেন:

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ

“বল, কে তোমাদের ত্রাণ করে স্থলভাগের এবং সমূদ্রের অন্ধকার হতে যখন তোমরা কাতরভাবে এবং গোপনে তার নিকট অনুনয় কর: ‘আমাদেরকে এ থেকে ত্রাণ করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত হব’? বল, ‘আল্লাহই তোমারেদকে তা থেকে এবং সমস্ত দুঃখ-কষ্ট বিপদ-আপদ থেকে ত্রাণ করেন। এতদসত্ত্বেও তোমরা তার শরীক কর।”[4]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ

“তিনিই আর্তের আহবানে সাড়া দেন যখন সে তাকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীত (পূর্ববর্তীদের) স্থলাভিষিক্ত করেন। আল্লাহর সাথে কি কোনো ইলাহ আছে? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে থাক।”[5]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“আল্লাহ তোমাকে বিপদ-কষ্ট দিলে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ করেন তবে তিনিই তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।”[6]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ

“এবং আল্লাহ তোমাকে বিপদ-আপদ দিলে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী কেউ নেই এবং আল্লাহ যদি তোমার মঙ্গল চান তবে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই।”[7]

এরূপ বহুসংখ্যক সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আয়াতের বিপরীতে একটি আয়াতেও মহান আল্লাহ বলেন নি যে, আমি বিপদ ত্রানের বা কষ্টদুঃখ দূর করার দায়িত্ব, অধিকার বা ক্ষমতা মুহাম্মাদ (ﷺ) বা অন্য কোনো নবী, নবী বংশের ইমাম বা কোনো ওলীকে প্রদান করেছি। উপন্তু বারংবার বলা হয়েছে যে, এরূপ কোনো অধিকার, সুযোগ বা ক্ষমতা আল্লাহ কাউকে কখনোই প্রদান করেননি। উপরে উল্লিখিত অনেক আয়াত ও হাদীসে তা আমরা দেখেছি।

মহান আল্লাহ তাঁর নবী-রাসূলগণের এবং বিশেষত মহানবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দু‘আ কবুল করতেন। তবে দু‘আ কবুল করা বা না করা পুরোপুরিই আল্লাহর এখতিয়ারে। তিনি আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা। তার অনেক দোয়া আল্লাহ কবুল করেছেন। আবার কখনো কখনো কবুল করেননি। আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফজরের শেষ রাকাতের রুকু থেকে ওঠার পরে কতিপয় কাফিরের জন্য বদদোয়া করে বলতেন: হে আল্লাহ, আপনি অমুক, অমুককে লানত করুন। তখন আল্লাহ তাঁকে নিষেধ করেন এবং বলেন[8]:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

“এ বিষয়ে আপনার কোনো অধিকার নেই, আল্লাহ চাইলে তাদেরকে ক্ষমা করবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন, কারণ তারা জালিম।”[9]

কুরআনে আল্লাহ বারংবার জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর প্রিয়তম হাবীব ও খলীল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে

মানুষের হিসাব, শাস্তি, কল্যাণ, অকল্যাণ ইত্যাদির ঝামেলায় ফেলেন নি। এগুলি সবই মহান আল্লাহর একক দয়িত্ব। মহান আল্লাহ যদি অপারগ হতেন বা তাঁর কারো সহযোগিতার প্রয়োজন হতো তবে অবশ্যই তিনি সর্বাগ্রে সর্বোচ্চ সহযোগিতা গ্রহণ করতেন তাঁর প্রিয়তম রাসূল থেকে। কিন্তু তিনি যেহেতু কারো সহযোগিতার মুখাপেক্ষী নন, সেহেতু তিনি তাঁর প্রিয়তমকে এ সকল বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলেন নি।

وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

"তাদেরকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি প্রদান করি তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দিই অথবা (তার পূর্বেই) তোমার মৃত্যু ঘটিয়ে দিই, তবে তোমার কর্তব্য তো কেবল প্রচার করা এবং হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ।"[10]

তাঁর দু'আয় আল্লাহ অসংখ্য মানুষকে মাফ করেছেন। তাঁর শাফায়াতে অসংখ্য পাপী মুসলিমকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। তবে তাঁর দু'আ ও শাফায়াত কবুল করা আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহর রহমত ও তাঁর রাসূলের দু'আর কল্যাণ পাওয়ার যোগ্য কে তা আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহ বলেছেন:

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

"আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা ক্ষমা প্রার্থনা না করুন একই কথা। আপনি সত্তর বার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।"[11]

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, যখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন: "তোমার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও"[12] তখন তিনি তাঁর নিকট আত্মীয়দের একত্রিত করে বলেন:

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ... اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا

"হে কুরাইশ বংশের লোকেরা, তোমরা (নিজের ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে) নিজেদেরকে ক্রয় কর; আমি আল্লাহর পরিবর্তে তোমাদের কোনোই উপকারে আসব না। হে আবদ মানাফ গোত্রের মানুষেরা, আমি আল্লাহর পরিবর্তে তোমাদের কোনোই উপকারে আসব না। হে আববাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব, আমি আল্লাহর পরিবর্তে আপনার কোনোই উপকারে আসব না। হে রাসূলুল্লাহ্র ফুফু সাফিয়া, আমি আল্লাহর পরিবর্তে আপনার কোনোই উপকারে আসব না। হে মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমা, আমার সম্পদ থেকে তুমি যা ইচ্ছা চেয়ে নাও, আমি আল্লাহর পরিবর্তে তোমার কোনোই উপকারে আসব না।"[13]

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন,

قَامَ فِينَا النَّبِيُّ (ﷺ) فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ لا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ

"নবী (ﷺ) আমাদের মধ্যে দন্ডায়মান হয়ে যাকাত বা সরকারী সম্পদ অবৈধভাবে ভোগ করার বা মালিকানায় নেওয়ার বিষয়ে কথা বললেন। তিনি এর কঠিন পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, তোমাদের কাউকে যেন কিয়ামতের দিন এমন না পাই যে, তার কাঁধে একটি চিৎকার রত মেষ অথবা ঘোড়া রয়েছে, সে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে উদ্ধার করুন। তখন আমি বলব: তোমার জন্য কোনো কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি তো তোমাকে জানিয়েছিলাম। অথবা তাঁর কাঁধে চিৎকার রত উট থাকবে, সে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে উদ্ধার করুন, আমি বলব, তোমার জন্য কোনো কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি তো তোমাকে জানিয়েছিলাম। অথবা তার কাঁধে নীরব (জড়) সম্পদ থাকবে এবং সে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে উদ্ধার করুন, আমি বলব, তোমার জন্য কোনো কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি তো তোমাকে জানিয়েছিলাম।"[14]

উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, একজন মুনাফিক মুসলমানদের খুব কষ্ট দিত। তখন আবূ বাকর (রা) বলেন, চল, আমরা এ মুনাফিক থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট আবেদন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إِنَّهُ لاَ يُسْتَغَاثُ بِيْ، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللهِ

"আমার কাছে ত্রাণ প্রার্থনা করতে হয় না, একমাত্র আল্লাহর কাছেই ত্রাণ প্রার্থনা করতে হয়।"[15]

এখানে লক্ষণীয় যে, সাহাবীগণ এখানে উদ্ধার প্রার্থনা বলতে জাগতিক ও লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা বুঝিয়েছিলেন। তাঁদের কথার স্বাভাবিক অর্থ, চল, আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এ মুনাফিকের কষ্ট থেকে বাঁচার বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করি, বা তাঁকে অনুরোধ করি, এ মুনাফিকের শাস্তির ব্যবস্থা করে আমাদেরকে এর অত্যাচার থেকে রক্ষা করুন। এরূপ জাগতিক সাহায্য, সহযোগিতা বা ত্রাণ প্রার্থনার মধ্যে কোনো দোষ নেই। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে শেখালেন যে, সকল বিষয়েই একমাত্র আল্লাহর কাছেই ত্রাণ প্রার্থনা করতে হয়।

মুসলিম উম্মাহর অবনতির দিনগুলিতে কোনো কোনো আলিম এ সকল আয়াত ও হাদীসের দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনার বিপরীতে দাবি করতে থাকেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আল্লাহ কল্যাণ অকল্যাণের ক্ষমতা প্রদান করেছেন। বিষয়টিকে তাঁরা মুমিনের ঈমানের অংশ বানিয়ে নেন। এরূপ দাবির ভিত্তিতে তারা দাবি করেন যে, বিপদে আপদে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হয় এবং তিনি যাকে ইচ্ছা অলৌকিকভাবে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন। কুরআন কারীমের সুস্পষ্ট নির্দেশনা সাথে সাংঘর্ষিক এ মতটির পক্ষে তারা কোনোরূপ সুস্পষ্ট আয়াত বা হাদীসকে তাঁদের মতের দলিল হিসেবে পেশ করেননি। বরং দ্ব্যর্থবোধক কিছু কথার তাঁরা বিশেষ একটি অর্থ গ্রহণ করেন এবং সেই 'অর্থ'-কে ভিত্তি করে দ্ব্যর্থহীন অগণিত আয়াত ও হাদীসকে বাতিল করে দেন। তাঁদের এ জাতীয় দলিলের দু একটি নমুনা উল্লেখ করছি।

প্রথম দলীল: মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

"নিশ্চয় আমি আপনাকে রাসূল বানিয়েছি কেবলমাত্র সমস্ত সৃষ্টি জগতের রহমত-স্বরূপ।"[16]

এখানে আল্লাহ স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রিসালাত বা তাঁকে রাসূল হিসেবে পাঠানো সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত স্বরূপ। তাঁর রিসালাতের প্রতি ঈমান গ্রহণ ও তাঁর অনুসরণই আল্লাহর রহমত লাভের

একমাত্র পথ। কিন্তু এ আয়াতের অর্থে তারা বলেন, বিশ্বজগতের রহমত তার অধিকারে রাখা হয়েছে। কাজেই রহমত বণ্টনের ক্ষমতা ও অধিকার তাঁরই। আরবী ভাষা, নাহউ ও 'তারকীব' সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, এরূপ ব্যাখ্যা আয়াতটির অর্থ বিকৃতি ছাড়া কিছুই নয়।

দ্বিতীয় দলীল: ইমাম বুখারী (রাহ) বলেন[17]:

بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ)، يَعْنِي لِلرَّسُولِ قَسْمَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللَّهُ يُعْطِي.

মহান আল্লাহর বাণী ''(যুদ্ধে যা তোমরা গনীমত লাভ কর) তার একপঞ্চমাংশ আল্লাহর এবং রাসূলের) এ বিষয়ক অধ্যায়। অর্থাৎ এই একপঞ্চমাংশ সম্পদ বণ্টন করার দায়িত্ব রাসূলের। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি বণ্টনকারী ও খাজাঞ্চি এবং আল্লাহই প্রদান করেন।''

ইমাম বুখারী এ অধ্যায়ে নিম্নের হাদীসগুলি উল্লেখ করেন:

(১) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, একজন আনসারী সাহাবীর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তিনি তার নাম 'মুহাম্মাদ' রাখতে চান। তখন রাসূলুল্লাহ বলেন:

سَمُّوا بِاسْمِي وَلا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا (فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ) أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ

তোমরা আমার নামে নাম রাখবে, তবে আমার কুনিয়াতে (আবুল কাসিম) কুনিয়াত রাখবে না; কারণ আমাকে কাসিম অর্থাৎ বণ্টনকারী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে (দ্বিতীয় বর্ণনায়: আমি তো বণ্টনকারী মাত্র) তোমাদের মধ্যে বণ্টন করি।[18]

(২) মু'আবিয় (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَاللَّهُ الْمُعْطِي وَأَنَا الْقَاسِمُ (وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ) (وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي).

''আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের বিষয়ে প্রজ্ঞা (ফিক্হ) প্রদান করেন। আর আল্লাহই প্রদান করেন আর আমি বণ্টনকারী (দ্বিতীয় বর্ণনায়: আমি তো বণ্টনকারী মাত্র প্রদান করেন আল্লাহ)''[19]

(৩) আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَا أُعْطِيكُمْ وَلا أَمْنَعُكُمْ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ

''আমি তোমাদের প্রদানও করি না, তোমাদের প্রদান করা বন্ধও আমি করি না। আমি তো বণ্টনকারী মাত্র, যেখানে আমাকে আদেশ করা হয় সেখানেই আমি প্রদান করি।'[20]

(৪) খাওলা আনসারিয়্যাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

إِنَّ رِجَالا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

''কিছু মানুষ আল্লাহর সম্পদ স্বেচাচারিতামূলকভাবে অন্যায় খাতে খরচ করে, তদের জন্য রয়েছে কিয়ামতের দিন জাহান্নাম।''[21]

এ সকল হাদীসের অর্থ সূযের আলোর মতই পরিষ্কার। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধলব্ধ বা যাকাতের যে সকল সম্পদ বণ্টন করা দায়িত্ব রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রদান করা হয় সেগুলি বণ্টনের বিষয়ে তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশের বাইরে কিছুই করতেন না। নিজের ইচ্ছা বা আগ্রহে তিনি কাউকে কিছু দিতেন না, বরং আল্লাহর বিধান অনুসারেই তা বণ্টন করতেন।

এ বণ্টনের সাথে গাইবী সাহায্য, রহমত বা অলৌকিক কিছু বণ্টনের সামান্যতম কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু এ মতের অনুসারীরা এ হাদীসের একটি বাক্য (আমি বণ্টনকারী) উল্লেখ করে দাবি করেন যে, তিনি বণ্টনকারী অর্থ আল্লাহর রহমত বা অলৌকিক সাহায্য বণ্টন করার দায়িত্ব তাঁর।

নিঃসন্দেহে তাদের এ ব্যাখ্যা পদ্ধতি হুবহু খৃস্টানগণের পদ্ধতির মতই। এভাবে তাঁরা একটি অপ্রাসঙ্গিক হাদীসকে সম্পূর্ণ মনগড়া বিকৃত অর্থ করে তার ভিত্তিতে অগণিত দ্ব্যর্থহীন আয়াত ও হাদীস বিভিন্ন উদ্ভট ও অবাস্তব ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করে দেন।

তৃতীয় দলীল: আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تَلْغَثُونَهَا أَوْ تَرْغَثُونَهَا

"আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, এমতাবস্থায় আমি দেখলাম যে, আমাকে পৃথিবীর ভান্ডারসমূহের চাবিগুলি প্রদান করা হলো এবং তা আমার সামনে রাখা হলো। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) চলে গিয়েছেন এখন তোমরা সে ভান্ডারগুলি পরিতৃপ্তির সাথে ভোগ করছ।"[22]

এখানে খুবই স্পষ্ট যে, পৃথিবীর ভান্ডারের চাবি বলতে পৃথিবীর ধনসম্পদ তার উম্মাতের নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে বুঝানো হয়েছে। সাহাবী আবূ হুরাইরা (রা) তাই বুঝেছেন। এজন্য তিনি বলছেন যে, পৃথিবীর ভান্ডারগুলি এখন তোমরা ভক্ষণ করছ।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজেই এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। উকবা ইবনু আমির (রা) বলেন,

إِنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ وفي رواية: مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا

"নবী (ﷺ) একদিন বের হয়ে উহুদের শহীদের উপর জানাযার সালাতের মত সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি মিম্বারের কাছে ফিরে আসলেন এবং বললেন: আমি তোমাদের আগে চলে যাচ্ছি এবং আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী। আর আমি আমার হাউয এখন দেখতে পাচ্ছি। আমাকে পৃথিবীর ভান্ডারসমূহের চাবিগুলি অথবা তিনি বলেন, আমাকে পৃথিবীর চাবিগুলি প্রদান করা হয়েছে, অন্য বর্ণনায়: আমাকে পৃথিবী ও আসমানের ভান্ডারসমূহের চাবিগুলি প্রদান করা হয়েছে এবং আল্লাহর কসম, আমি এ ভয় পাই না যে, আমার পরে তোমরা শিরক করবে, বরং ভয় পাই যে, তোমরা সেগুলি (ভান্ডারগুলি) নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে।"[23]

এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলছেন, তাঁর উম্মাত তাঁকে দেওয়া পৃথিবীর বা পৃথিবীর ও আসমানের ভান্ডারগুলির চাবি

বা ভান্ডারগুলি নিয়ে অর্থাৎ দুনিয়ার ধন-সম্পদ নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে বলে তিনি ভয় পান। এভাবে আমরা দেখি যে, 'পৃথিবীর ভান্ডারসমূহ বা পৃথিব ও আসমানের ভান্ডারসমূহ বলতে ধন-সম্পদ বুঝানো হয়েছে, কোনো গাইবী ক্ষমতার ভান্ডার বুঝানো হয় নি। কারণ গাইবী ক্ষমতার ভান্ডার নিয়ে উম্মাত প্রতিযোগিতা করে না এবং এরূপ প্রতিযোগিতার সুযোগ থাকলে তা শিরকের মত কোনো খারাপ বা ভয়ের কারণ না।

আবূ মুহাইহিবা (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বলেন,

يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ إِنَّ اللهَ خَيَّرَنِيْ أَنْ يُؤْتِيَنِيْ خَزَائِنَ الأَرْضِ وَالْخُلْدَ فِيْهَا ثُمَّ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّيْ، فَقُلْتُ: بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ فَخُذْ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ هذِهِ الأَرْضِ وَالْخُلْدَ فِيْهَا ثُمَّ الْجَنَّةَ. قال: كَلاَّ، يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ لَقَدْ اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّي عز وجل

"আল্লাহ আমাকে এখতিয়ার দিয়েছেন যে, দুটি বিষয়ের একটি আমি বেছে নেব: (১) পৃথিবীর ভান্ডারসমূহ এবং পৃথিবীতে অনন্ত জীবন এবং এরপর জান্নাত, অথবা (২) আমার প্রতিপালকের সাক্ষাত এবং জান্নাত। তখন আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবানী হোন! তাহলে আপনি পৃথিবীর ভান্ডারসমূহ এবং পৃথিবীতে অনন্ত জীবন এবং এরপর জান্নাত বেছে নিন। তিনি বলেন, কখনোই না! আবূ মুহাইহিবা, আমি আমার প্রতিপালকের সাক্ষাত বেছে নিয়েছি।"[24]

সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ

"মহান আল্লাহ আমার জন্য পৃথিবীকে সংকুচিত করেন এবং আমি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমগুলি দেখতে পাই, আর আমার জন্য যতটুকু সংকুচিত করা হয়েছিল সে পর্যন্ত আমার উম্মাতের রাজত্ব পৌঁছাবে। আর আমাকে লাল ও সাদা উভয় ধনভান্ডার প্রদান করা হয়েছে।"[25]

এভাবে কিছু হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে পৃথিবীর বা পৃথিবী ও আসমানের ভান্ডারসমূহের চাবি প্রদান করা হয়েছিল। সাহাবীগণ ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ স্বভাবতই 'ভান্ডারসমূহের চাবি' বলতে 'ধন-সম্পদের অধিকার' বুঝিয়েছেন যা তাঁর উম্মাত তাঁর ওফাতের পরে লাভ করে। কিন্তু গত কয়েকশত বৎসর যাবৎ কেউ কেউ এ সকল হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন যে, তাঁকে মহান আল্লাহর সকল গাইবী ভান্ডারের কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাদের এ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

প্রথমত, উপরে আমরা দেখেছি যে, কুরআন কারীমে বলা হয়েছে: "বল, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডারসমূহ রয়েছে, অদৃশ্য (গায়েব) সম্বন্ধেও আমি অবগত নই...।" এর বিপরীতে একটি আয়াত বা হাদীসেও বলা হয় নি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে "আল্লাহর ভান্ডারসমূহের চাবি' প্রদান করা হয়েছে। বরং এ সকল হাদীসে বলা হয়েছে যে, তাঁকে 'পৃথিবীর বা পৃথিবী ও আসমানের ভান্ডারসমূহের চাবি' প্রদান করা হয়েছে। কাজেই এ সকল হাদীসকে কুরআনের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আয়াতগুলির বিপরীতে দাঁড় করানোর কোনোরূপ সুযোগ নেই। ওহীতে যতটুকু বলা হয়েছে আমরা ততটুকুই বলব। কুরআনের নির্দেশনা অনুসারে আমরা বলব যে, 'আল্লাহর ভান্ডারসমূহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে নয়।' আর উপরের হাদীসগুলির নির্দেশনা অনুসারে আমরা বলব যে, 'পৃথিবীর বা পৃথিবীর ও আসমানের ভান্ডারসমূহের চাবি তাঁকে প্রদান করা হয়, যেগুলি পরবর্তীতে তাঁর

উম্মাত ভোগ ও ভক্ষণ করেছে এবং তা নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে।’ ওহীর মাধ্যমে যা বলা হয়েছে ততটুকুই যিনি বলবেন তিনি নিরাপদ। ওহীর বাইরে অতিরিক্ত কিছু বলা বা ব্যাখ্যার নামে ওহীর নির্দেশনা বাতিল করা মুমিনের জন্য কঠিন বিভ্রান্তির পথ উন্মোচন করে, তা যে যুক্তিতে বা যে নিয়্যাতেই করা হোক না কেন।

দ্বিতীয়ত, এ সকল হাদীসের স্পষ্ট ও সরল অর্থ তারা পরিত্যাগ করেছেন। এ সকল হাদীসের ক্ষেত্রে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে অর্থ বলেছেন এবং সাহাবী-তাবিয়ীগণ যে অর্থ বলেছেন তা প্রত্যাখ্যান করে মনগড়া একটি ব্যাখ্যা করেছেন।

তৃতীয়ত, তাঁরা এরূপ একটি মনগড়া ব্যাখ্যাকে আকীদার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে তাঁরা কুরআন ও হাদীসের বহুসংখ্যক দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বাতিল করেছেন।

চতুর্থত, তাঁরা এমন একটি আকীদা উদ্ভাবন করেছেন যে আকীদা কুরআন বা হাদীসে কোথাও নেই এবং সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ বা পূর্ববর্তী কোনো আলিম কখনোই বলেন নি। যেমন তারা বলেন:

‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সকল হাজত প্রয়োজন বণ্টন করেন, দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে। বিশ্বে যা কিছু প্রকাশিত হয় সবই একামাত্র মুহাম্মাদ (ﷺ) প্রদান করেন, তাঁর হাতেই ‘চাবিসমূহ’, আল্লাহর ভান্ডারগুলি থেকে কিছুই তাঁর হাত ছাড়া বের হয় না, তিনি যদি কিছু ইচ্ছা করেন ততে তার বিপরীত কিছু হতে পারে না, তার নির্দেশের বিরোধিতা করার মত বিশ্বে কিছু নেই। ‘বিশ্বের সবকিছু পরিচালনার ক্ষমতা তাঁর’, তিনি দুনিয়া ও আখিরাতের সকল প্রয়োজন মেটান, আল্লাহর কাছে তাঁর একত্ব ছাড়া আর কি আছে, তোমার কিছু প্রয়োজন হলে তুমি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নিকট প্রার্থনা কর, ‘তাঁর কতৃত্ব ছাড়া কোনো কাজই হয় না’, তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়, তার বিপরীতে কিছুই হয় না, তিনিই দেন এবং তিনিই আটকে দেন, তিনিই সকল বিপদগ্রস্থের বিপদ কাটান এবং যাকে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করান, ইত্যাদি... ইত্যাদি ... ইত্যাদি।’

কুরআন কারীম, সকল সহীহ হাদীস, দুর্বল হাদীস এবং জাল ও বানোয়াট হাদীস তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও আপনি এ কথাগুলি কোথাও পাবেন না। সাহাবীদের জীবন খুঁজে দেখুন, এ সকল কথার সামান্যতম ইশারাও তাদের কোনো কথায় পাবেন না। কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের জীবনে যা কিছু পাবেন সবই এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের বক্তব্য থেকে পাঠক দেখবেন যে, এ সকল বিষয় সবই একমাত্র এবং কেবল মাত্র মহান আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কেবলমাত্র তিনিই এসকল ক্ষমতার মালিক। এর বাইরে কিছই বলা হয় নি।

এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের কিছু নির্দেশনা নির্দেশনা আমরা উপরে দেখেছি। সকল আয়াত ও হাদীস আলোচনা করতে গেলে বইয়ের কলেবর আরো অনেক বেড়ে যাবে। উপরের আয়াত ও হাদীসগুলি থেকে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তাঁর নিজের এবং অন্যান্যদের কল্যাণ বা অকল্যাণের কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব তাঁকে প্রদান করা হয় নি বলে কুরআন ও হাদীসে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর বিপরীতে একটি আয়াত বা হাদীসেও উল্লেখ করা হয় নি যে, তাঁকে এরূপ কোনো দায়িত্ব বা ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

পঞ্চমত: কুরআন ও হাদীসের সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক এরূপ ‘আকীদা’ তৈরি করার পরে তাঁরা এর ভিত্তিতে বিপদে আপদে তাঁর কাছে সাহায্য বা ত্রাণ প্রার্থনা করার রীতি প্রচলন করেছেন।

প্রতিদিন অগণিতবার আমরা বলছি: ‘‘আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনার কাছেই সাহায্য চাই।’’ এ হলো মুমিনের ঈমান। কুরআন ও হাদীসের সর্বত্রই এ শিক্ষাই বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর

চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ৮ম হিজরী সালে মক্কা বিজয়ের পরে তিনি মদীনায় হিজরত করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শেষ জীবনে প্রায় আড়াই বৎসর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহচার্যে থাকেন। বিশেষত বিদায় হজ্জের সময় তিনি তাঁর সাথে উটের পিঠে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি বলেন,

كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الأَقْلامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ

"আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিছনে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন : 'হে বালক, আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিচ্ছি। তুমি আল্লাহকে (তাঁর বিধানাবলীকে) হেফাযত করবে, তাহলে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহকে (তোমার অন্তরে সদা জাগরুক ও) সংরক্ষিত রাখবে, তাহলে তাঁকে সর্বদা তোমার সামনে পাবে। যখন চাইবে বা প্রার্থনা করবে তখন শুধু আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রাখ, যদি সকল মানুষ তোমার কোনো কল্যাণ করতে সম্মিলিত হয়, তাহলে তারা তোমার শুধুমাত্র ততটুকুই কল্যাণ করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। আর যদি তারা সবাই তোমার অকল্যাণ করতে একজোট হয়, তাহলে তারা তোমার শুধুমাত্র ততটুকুই অকল্যাণ করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার বিরুদ্ধে নির্ধারণ করেছেন। কলমগুলি উঠে গেছে এবং পৃষ্ঠাগুলি শুকিয়ে গিয়েছে।"[26]

এভাবে কুরআন-হাদীসে অগণিত স্থানে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মুমিনগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সকল বিপদে কষ্টে একমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে। আমি আমার লেখা 'রাহে বেলায়াত' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ক অনেক হাদীস ও মাসনূন দু'আ আলোচনা করেছি। এর বিপরীতে একটি নির্দেশও নেই যে, বিপদে-আপদে তোমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে যে বলবে, হে রাসূল, আপনি আমাদেরকে বিপদ থেকে বাঁচান।

ষষ্ঠত: সাহাবীগণের জীবন দেখুন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় তাঁরা তাঁর কাছে দু'আ চেয়েছেন, তবে কখনোই তাঁর কাছে যেয়ে বলেন নি, আমাদের বিপদ আপনি কাটিয়ে দেন। তাঁর ওফাতের পরে তাঁর রাওযা মুবারাকায় যেয়ে তাঁরা কখনোই তাঁর কাছে বিপদ কাটিয়ে দেওয়ার আবেদন করেননি। এমনকি কখনো তাঁরা তাঁর রাওযায় যেয়ে তাঁর কাছে স্বাভাবিক দু'আও চান নি। কখনোই তাঁরা রাওযায় যেয়ে বলেন নি, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন বা ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর সাহাবীগণের পথ থেকে বিচ্যুতি অর্থই ধ্বংস। আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ বলেছেন, "কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিক সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করিব, আর তা কতই না মন্দ আবাস!"[27]

এখানে 'মুমিনগণ' পথ বলতে স্বভাবতই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সময়ের মুমিন অর্থাৎ সাহাবীগণকে বুঝানো হয়েছে। যদি কেউ সাহাবীগণের পদ্ধতি পরিত্যাগ করে তবে তার পরিণতি সহজেই অনুমেয়।

সপ্তমত: এখানে খৃস্টানদের অবস্থা উল্লেখ্য। তারা বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের সকল ভালমন্দের ক্ষমতা 'ঈসা (আঃ)-কে প্রদান করা হয়েছে। কাজেই তার কাছেই সব কিছু চাইতে হবে। তাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয়, বর্তমান

তোমাদের মধ্যে প্রচলিত বিকৃত বাইবেল থেকেই একটি আয়াত বের করে দেখাও যেখানে ঈসা (আঃ) বলেছেন যে, তোমরা আমার ইবাদত কর বা আমার কাছে ভালমন্দ প্রার্থনা কর। তারা বলে, তিনি ইহূদীদের ভয়ে এবং মানুষ বুঝবে না বলে এ কথা স্পষ্টভাবে বলেন নি, তবে অমুক স্থানে এ বিষয়ে ‘ইঙ্গিত’ আছে, অমুক আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে তা বুঝা যায় ... ইত্যাদি। এভাবে ইঙ্গিত, ব্যাখ্যা ইত্যাদির মাধ্যমে এমন একটি আকীদা তারা বানিয়েছে যার অস্তিত্ব বিকৃত বাইবেলের মধ্যেও নেই।

অষ্টতম: মুসলিম উম্মাহর অবনতির দিনের এ সকল মানুষের অবস্থা দেখে আরবের মুশরিকদের অপরাধ অপেক্ষাকৃত হালকা মনে হতে পারে! ফিরিশতাগণকে দায়িত্ব প্রদানের কথা এবং তাদের শাফা‘আত কবুল করার কথা মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে সুস্পষ্টতই বলেছেন। আরবের মুশরিকগণ একটু বাড়িয়ে ফিরিশতাগণের দায়িত্বকে ক্ষমতা ও শাফা‘আতের সুযোগকে অধিকার বলে মনে করে তাদের কাছে প্রার্থনা করে, তাদেরকে ডেকে এবং তাদের নামে নযর-মানত করে শিরকে নিপতিত হয়েছে। পক্ষান্তরে নবী-ওলীগণকে আল্লাহ কোনোরূপ অলৌকিক দায়িত্ব বা বিশ্ব পরিচালনা দায়িত্ব দিয়েছেন বলে কুরআন বা হাদীসে কোথাও বলেন নি। তার পরেও কিছু ফযীলত জ্ঞাপক অপ্রাসঙ্গিক হাদীসকে মনগড়া ব্যাখ্যা করে মুসলিম সমাজের কেউ কেউ দাবি করছেন যে, মহান আল্লাহ নবী-ওলীগণকে দায়িত্ব দিয়েছেন। এরপর তাঁরা সে দায়িত্বকে ক্ষমতা বলে দাবি করছেন। এরপর তাঁরা তাদের কাছে প্রার্থনা করছেন।

এখানে মুমিনকে বুঝতে হবে যে, নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভক্তি ও ভালবাসা এবং তাঁর প্রশংসা করা ঈমানের মূল ও মুমিনের অন্যতম সম্বল। তবে এ জন্য কুরআন কারীমের অগণিত আয়াত ও অগণিত সহীহ হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশের বাইরে আমাদের যয়ীফ, মিথ্যা, বানোয়াট কথা বলতে হবে, বা যুক্তি, তর্ক, ব্যাখ্যা, সম্ভাবনা ইত্যাদি দিয়ে কিছু কথা বানাতে হবে- এ ধারণাটিই ইসলাম বিরোধী।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মর্যাদা বিষয়ক উপরের বিভ্রান্তিকর আকীদাগুলির ক্ষেত্রে মূল সমস্যা আকীদার উৎসে বিভ্রান্তি। এখানে মূলত কিছু মানুষের বক্তব্যকে এবং নিজের পছন্দকে আকীদার মুল উৎসরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের যা কিছু বলা হয়, তা একান্তই এ সকল বক্তব্যকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সমর্থন করার জন্য। এরূপ আকীদা পোষণকারীকে যদি আপনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সকল গাইব জানতেন না, তিনি মঙ্গল-অমঙ্গলের ক্ষমতা রাখেন না, তাঁর কাছে গাইবী সাহায্য, বিপদ থেকে মুক্তি ইত্যাদি প্রার্থনা করা যাবে না, তবে তিনি আপনার ‘আকীদা’ বিভ্রান্ত বলে গণ্য করবেন। আপনি যদি এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলি তাকে বলেন তবে তিনি বলবেন: এগুলি আছে ঠিকই, তবে এগুলির অন্য ব্যাখ্যা আছে। আপনি যদি বলেন, এ ব্যাখ্যা কি আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন? সাহাবীগণ বলেছেন? তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, এরূপ কোনো ব্যাখ্যা তাঁদের থেকে কোনো সহীহ সনদে বর্ণিত হয় নি। তবে পরবর্তী যুগের বিভিন্ন আলিমের নাম উল্লেখ করে বলবেন যে, অমুক বা তমুক এ কথা বলেছেন।

এবার আপনি যদি তাঁর ‘আকীদা’র বিষয়ে প্রশ্ন করেন যে, আপনি যে আকীদা বিশুদ্ধ বলে দাবি করছেন তা কি কুরআন বা হাদীসে কোথাও সুস্পষ্টভাবে আছে? তিনি বলবেন, অমুক আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে বা অমুক হাদীস থেকে তা বুঝা যায়। আপনি যদি প্রশ্ন করেন, এ সকল ব্যাখ্যা কি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা সাহাবীগণ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে? তিনি পরবর্তী যুগের বিভিন্ন আলিমের নাম উল্লেখ করে বলবেন, অমুক বা তমুক বলেছেন।

এ জাতীয় সকল আকীদার ক্ষেত্রেই এরূপ দেখতে পাবেন। বিদ‘আত ও ফিরকা বিষয়ক অধ্যায়ে আমরা দেখব যে

শীয়া, মুতাযিলী ইত্যাদি সকল বিভ্রান্ত ফিরকার আকীদার অবস্থা একইরূপ।

এ সকল ক্ষেত্রে মুমিনের জন্য নাজাতের একমাত্র উপায় হলো, সকল ক্ষেত্রে, বিশেষত আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আক্ষরিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহর উপর নির্ভর করা। বিশ্বাসের ভিত্তি 'গাইবী' বিষয়ের উপরে। এ সকল বিষয়ে ওহীর নির্দেশনা ছাড়া কোনো ফয়সালা দেওয়া যায় না। কর্ম বিষয়ে কুরআন বা হাদীসে সুস্পষ্ট বিধান নেই এরূপ অনেক নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবিত হয়, এজন্য সেক্ষেত্রে কিয়াস ও ইজতিহাদের প্রয়োজন হয়। যেমন মাইক, ধুমপান ইত্যাদি বিষয়। কিন্তু বিশ্বাস বা আকীদার বিষয় সেরূপ নয়। এগুলিতে নতুন সংযোজন সম্ভব নয়। এজন্য এ বিষয়ে কিয়াস বা ইজতিহাদ অর্থহীন। আল্লাহর গুণাবলি, নবীগণের সংখ্যা, মর্যাদা, ফিরিশতাগণের সংখ্যা, সৃষ্টি, কর্ম, দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ইজতিহাদের কোনো সুযোগ নেই। কুরআন ও হাদীসে যেভাবে যতটুকু বলা হয়েছে তাই বিশ্বাস করতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে আমরা ওহীর কথাকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করতে পারি, কিন্তু যুক্তি দিয়ে কোনো কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারি না।

এখানে মুমিনের মুক্তির একমাত্র উপায় হলো, কুরআন কারীমের সকল কথাকে সমানভাবে গ্রহণ করা এবং কোনো কথাকে প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য কথাকে বাতিল বা ব্যাখ্যা না করা। অনুরূপভাবে সকল সহীহ হাদীসকে সহজভাবে মেনে নেওয়া। একান্ত প্রয়োজন না হলে কোনো ব্যাখ্যার মধ্যে যেতে নেই। একান্ত প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করলেও গুরুত্বের কম বেশি হবে কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে। স্পষ্ট কথাকে অস্পষ্ট কথার জন্য ব্যাখ্যা সাপেক্ষে বাতিল করা যাবে না। বরং প্রয়োজনে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কথার জন্য অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক কথার ব্যাখ্যা করতে হবে। 'খবর ওয়াহিদ' একক হাদীসের জন্য কুরআনের স্পষ্ট বাণী বা মুতাওয়াতির ও মশহূর হাদীস বাতিল করা যাবে না। প্রয়োজনে কুরআন বা প্রসিদ্ধ হাদীসের জন্য একক ও দ্ব্যর্থ বোধক হাদীসের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা করতে হবে। এ ছাড়া ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে সাহাবীগণের অনুসরণ করতে হবে। যে বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট কিছু নেই এবং সাহাবীগণও কিছু বলেন নি, সে বিষয়ে চিন্তা না করা, কথা না বলা ও বিতর্কে না জড়ানোই মুমিনের নিরাপত্তা ও মুক্তির পথ।

ফুটনোট

[1] সূরা (৭) আ'রাফ: ১৮৮ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা (১০) ইউনূস: ৪৯ আয়াত।
[2] সূরা (১০) ইউনুস: ৪৯ আয়াত।
[3] সূরা (৭২) জিন্ন: ২১-২২ আয়াত।
[4] সূরা (৬) আন'আম: ৬৩-৬৪ আয়াত।
[5] সূরা (২৭) নামল: ৬২ আয়াত।
[6] সূরা (৬) আন'আম: ১৭ আয়াত।
[7] সূরা (১০) ইউনুস: ১০৭ আয়াত।
[8] সূরা (৩) আল ইমরান: ১২৮ আয়াত।
[9] বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৪৯৩, ১৬৬১, ৫/২৩৪৮, ৬/২৬৭৪; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৪৬৬-৪৬৭, ৩/১৪১৭; তাবারী, তাফসীর (জামিউল বায়ান ৪/৮৬-৮৯; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৭/৩৬৫, ১১/১৯৩, ১৩/৩১২।
[10] সূরা (১৩) রা'দ: ৪০ আয়াত।
[11] সূরা (৯) তাওবা: ৮০ আয়াত।

[12] সূরা (২৬) শু'আরা: ২১৪ আয়াত।

[13] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৯২, ৪/১৭৮৭; মুসলিম, আস-সহীহ ১/১৯২; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৫/৩৮৩, ৬/৫৫১, ৮/৫০১।

[14] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১১৮, ৩/১৩৯৬; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৬১।

[15] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/৪০, ১০/১৫৯। হাইসামী হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, হাদীসের সনদের সকল রাবী বুখারী-মুসলিমের রাবী, কেবলমাত্র ইবনু লাহিয়্যাহ বাদে, আর ইবনু লাহিয়্যাহর হাদীস হাসান। ইবনু লাহিয়্যাহর বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের মতভেদ আছে।

[16] সূরা (২১) আনবিয়া: ১০৭ আয়াত।

[17] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১৩৩।

[18] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১৩৩-১১৩৪ ৫/২২৯০; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৮২-১৬৮৩।

[19] বুখারী, আস-সহীহ ১/৩৯, ৩/১১৩৪, ৬/২৬৬৭; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৭১৯।

[20] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১৩৪।

[21] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১৩৫।

[22] বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬৫৪।

[23] বুখারী, আস-সহীহ ১/৪৫১, ৪/১৪৯৮; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭৯৫; ইবনু হিববান, আস-সহীহ ৭/৪৭৪।

[24] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৩/৫৭। হাদীসটি সহীহ।

[25] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২২১৫।

[26] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৬৬৭, নং ২৫১৬, মুসতাদরাক হাকিম ৩/৬২৩, ৬২৪। হাদীসটি সহীহ।

[27] সূরা (৪) নিসা: ১১৫ আয়াত।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13640

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন